Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও হাদীসের আলোকে দাওয়াহ ও তাবলীগ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

এ এল এম রইসুল আলম

রোলঃ 21500792228

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও হাদীসের আলোকে দাওয়াহ ও তাবলীগ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

এ এল এম রইসুল আলম

রোলঃ 21500792228

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআন ও হাদীসের আলোকে দাওয়াহ ও তাবলীগ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে এ এল এম রইসুল আলম, আইডিঃ 21500792228 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন ও হাদীসের আলোকে দাওয়াহ ও তাবলীগ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

RAlam

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

এ এল এম রইসুল আলম

আইডিঃ 21500792228

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১ ভূমিকা..6

অধ্যায় ২: দাওয়াহ ও তাবলীগের ধারণা ও গুরুত্ব 14

অধ্যায় ৩: কুরআনে দাওয়াহ ও তাবলীগের নির্দেশনা..18

অধ্যায় ৪: হাদীসের আলোকে দাওয়াহ ও তাবলীগ..28

অধ্যায় ৫: দাওয়াহ ও তাবলীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 35

অধ্যায় ৬: দাওয়াহ ও তাবলীগের প্রধান বৈশিষ্ট্য..39

অধ্যায় ৭: আধুনিক যুগে দাওয়াহ ও তাবলীগের চ্যালেঞ্জ 45

অধ্যায় ৮: সমাধান ও কার্যকর দাওয়াহ কৌশল..50

উপসংহার ও পরামর্শ..59

তথ্যসূত্র:...61

১ ভূমিকা

মানবজাতির জীবনে শান্তি ও কল্যাণের বার্তা নিয়ে যুগে যুগে মহান আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। এই সম্মানিত নবী-রাসূলগণ একটি অভিন্ন আহ্বান মানবজাতির নিকট পৌঁছে দিয়েছেন—তা হলো, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং আল্লাহ ছাড়া সকল উপাস্যকে বর্জন করা। এই আহ্বানকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় দাওয়াহ ইলাল্লাহ বা আল্লাহর পথে আহ্বান। দাওয়াহ ও তাবলীগ ইসলামী শরিয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক দিক—এটি ইসলামের প্রাণ এবং মুসলিম উম্মাহর অপরিহার্য দায়িত্ব। দাওয়াহ'র মাধ্যমেই ইসলাম তার চিরন্তন সত্য ও শান্তির বাণী বিশ্বের আনাচে-কানাচে পৌঁছে দিয়েছে এবং মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছে।

'দাওয়াহ' শব্দটি আরবি, যার আক্ষরিক অর্থ হলো 'আহ্বান করা' বা 'ডাকা'। ইসলামী পরিভাষায় দাওয়াহ বলতে বোঝায়, মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করা এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করানো। দাওয়াহকে এক ধরনের আমন্ত্রণ হিসেবেও চিত্রিত করা হয়েছে। দাওয়াহ'র মাধ্যমে একজন ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সা.) এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে দৃঢ় ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস স্থাপন করতে শেখে। এটি মানুষকে উৎসাহিত করে—আল্লাহর কাছে নিজেকে, তার চিন্তা, অনুভূতি ও আবেগ সবকিছু সমর্পণ করতে। দাওয়াহ মানুষকে কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত রাখে এবং পাপ ও অপকর্ম থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে। উৎসগুলো অনুযায়ী, দাওয়াহ'র অর্থ কেবলমাত্র আহ্বান করা নয়; বরং এটি একটি বিস্তৃত পরিভাষা, যার মধ্যে রয়েছে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা।

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ
وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। তাদের অধিকাংশই ফাসিক।"

[সূরা আলে ইমরান, ৩:১১০]—

এই আয়াতের তাফসিরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, এটি বোঝায়—তারা মানুষকে এই সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করে যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই', এবং এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনে সংগ্রাম করে। তিনি আরও বলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সৎকাজ। সুতরাং, দাওয়াহ'র মূল ভিত্তি হলো তাওহীদের দিকে আহ্বান করা এবং মানুষকে শিরক ও কুফর থেকে ফিরিয়ে রাখা। এই আহ্বান একটি ঐশী দায়িত্ব, যা ভালোবাসা ও নম্রতার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের প্রতি প্রযোজ্য। এটি কেবল মুখের ভাষায় আহ্বান নয়; বরং এটি আচরণ, উত্তম দৃষ্টান্ত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশের মাধ্যমে পরিচালিত একটি সামগ্রিক পদ্ধতি।

অন্যদিকে, 'তাবলীগ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো 'পৌঁছে দেওয়া' বা 'প্রচার করা'। আরবি ভাষায় 'তাবলীগ' শব্দটি এসেছে 'বালিগ' শব্দ থেকে, যার একটি অর্থ হলো 'পরিপক্কতা' বা 'পূর্ণতা'। ইসলামী পরিভাষায়, তাবলীগ অর্থ হলো—দাওয়াহ'র বাণী ও আদর্শ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদেরকে দ্বীনের আদেশ মেনে চলার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। তাবলীগ মূলত এমন একটি ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, যা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও আদর্শকে মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দেয়। এটিকে দাওয়াহ'র পরবর্তী ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেখানে একজন ব্যক্তি আহ্বান প্রাপ্ত হয়ে তা গ্রহণ করে এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগের জন্য অনুপ্রাণিত হয়। তাবলীগের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের আদর্শ ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তাদেরকে দ্বীনের প্রতি আনুগত্যের পথে পরিচালিত করা হয়।

তাবলীগের উদ্দেশ্য হলো কুরআনের বাণী মানুষের মনে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করা। এটি শুধু একটি ধর্মীয় কাজ নয়, বরং একটি সামাজিক ও নৈতিক আন্দোলন, যা মানুষের জীবনকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করতে সহায়তা করে। তাবলীগের মাধ্যমে মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উৎসাহিত করা হয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়।

যেহেতু দাওয়াহ'র মূল কাজই হলো আল্লাহর দিকে আহ্বান করা এবং তাঁর বার্তা পৌঁছে দেওয়া, তাই তাবলীগ শব্দটিকে দাওয়াহ'র একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বা সমার্থক হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ

"হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা পৌঁছে দিন। যদি আপনি তা না করেন, তবে আপনি তাঁর বার্তা পৌঁছালেন না। আর আল্লাহ আপনাকে মানুষদের থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।"

(সূরা আল-মায়িদা, ৫:৬৭)

এখানে 'বাল্লিগ' অর্থাৎ 'পৌঁছে দেওয়া' বা 'তাবলীগ'-এর একটি স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এটি স্পষ্ট করে দেয় যে, দাওয়াহ ও তাবলীগ উভয়ই নবুওয়তের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। যারা দাওয়াহ'র কাজ করেন, তাদের দায়িত্ব হলো সেই বার্তাটি মানুষের মাঝে পৌঁছে দেওয়া।

এই প্রেক্ষাপট থেকে দেখা যায়, তাবলীগ হলো দাওয়াহ কার্যক্রমের মাধ্যমে আল্লাহর বার্তা প্রচার ও বিস্তারের একটি প্রক্রিয়া।

দাওয়াহ ও তাবলীগ—উভয়েরই মূল লক্ষ্য হলো মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদেরকে দ্বীনের অনুশাসন মানতে উদ্বুদ্ধ করা। এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ ইসলামের নৈতিক ও সামাজিক আদর্শে গড়ে ওঠে। দাওয়াহ ও তাবলীগের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে—তাওহীদের প্রতি আহ্বান, রিসালাতের প্রচার, আখিরাতের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি, ঈমান ও আমলের জাগরণ, এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধকরণ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা।

সুতরাং, দাওয়াহ হলো আহ্বান করা এবং তাবলীগ হলো সেই আহ্বান কার্যকরভাবে মানুষের মাঝে পৌঁছে দেওয়া। এই দুটি পরিভাষা একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং পরিপূরক।
এই প্রেক্ষাপটে, কুরআন ও হাদীসের আলোকে দাওয়াহ ও তাবলীগের মৌলিক নীতি, পদ্ধতি, সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ এবং তার সমাধান নিয়ে একটি বিশদ আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। এই গবেষণাটি সেই প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়েছে।

১.২ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

ইসলামী জ্ঞানের পরিসরে দাওয়াহ ও তাবলীগ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলেও, এর ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তি এবং আধুনিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োগের মাঝে সমন্বয়ের অভাব লক্ষণীয়। এ ক্ষেত্রের এ শূন্যতা পূরণে এই গবেষণাটি প্রস্তাবিত হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হলো কুরআন ও হাদীসের আলোকপাতে দাওয়াহ ও তাবলীগের তাত্ত্বিক ভিত্তি, ঐতিহাসিক প্রবাহ এবং সমসাময়িক বাস্তবতায় এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে একটি সুসংগঠিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা। এ কেন্দ্রীয় লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করতে নিচের সহায়ক উদ্দেশ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে:

গবেষণার নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. ধারণাগত ও পরিভাষাগত বিশ্লেষণ: কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত ‘দাওয়াহ’, ‘তাবলীগ’, ‘আমর বিল মারুফ’ ইত্যাদি পরিভাষার ভাষাগত ও প্রেক্ষিতগত ব্যাখ্যা প্রদান, যা দাওয়াহ ও তাবলীগের মৌলিক ধারণা অনুধাবনে সহায়ক হবে।

২. **ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তি নির্ধারণ:** কুরআনের আয়াত এবং হাদীসের আলোকে দাওয়াহ’র ফরজিয়ত, নৈতিকতা ও দার্শনিক ভিত্তি অন্বেষণ, যা মুসলমানদের এ দায়িত্ব পালনে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

৩. **ঐতিহাসিক ধারা পর্যালোচনা:** নবী কারীম (সা.) এর যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক তাবলীগ জামাআতের আবির্ভাব পর্যন্ত দাওয়াহের ধারাবাহিক বিকাশ বিশ্লেষণ। এতে রাসূল (সা.)-এর কৌশল, সাহাবায়ে কিরামের প্রচেষ্টা এবং মধ্যযুগীয় আলিমদের অবদান অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৪. **পদ্ধতিগত কাঠামো নির্ধারণ:** কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দাওয়াহর কার্যকর কৌশলসমূহ যেমন—হিকমত, সদাচরণ, উপদেশ, সহনশীলতা ইত্যাদি অনুশীলনের মাধ্যমে একটি প্রাঞ্জল নীতিমালা প্রস্তাব করা।

৫. **সমকালীন চ্যালেঞ্জ ও সমাধান:** বর্তমান দুনিয়ায় দাওয়াহ কার্যক্রমের সম্মুখীন প্রধান চ্যালেঞ্জ—যেমন সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব, প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব, জিহাদের অপব্যাখ্যা, ধর্মীয় বিভ্রান্তি ও সামাজিক রূপান্তর ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং ইসলামি সমাধানের সন্ধান।

৬. **তরুণদের প্রতি ইসলামের উপস্থাপন কৌশল:** বিকৃতি ছাড়া কীভাবে ইসলামকে আধুনিক তরুণ প্রজন্মের কাছে আগ্রহোদ্দীপকভাবে উপস্থাপন করা যায়—তা উদ্ভাবনে কার্যকর পদ্ধতি অনুসন্ধান, যাতে তারা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং দাওয়াহে অংশগ্রহণে আগ্রহী হয়।

১.৩ গবেষণার পরিধি ও পদ্ধতি

গবেষণার পরিধি:

এই গবেষণার মূল ভিত্তি হলো কুরআন এবং সহীহ হাদীস। পাশাপাশি প্রখ্যাত ইসলামি আলেমদের প্রণীত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী ও দাওয়াহ সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের বিশ্লেষণমূলক ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়বস্তুর গভীরতা বজায় রেখে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এর কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে তা সুসংহত, প্রাঞ্জল ও পাঠযোগ্য হয়।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ:

১. **মূল উৎসসমূহ:**

- **কুরআন শরীফ**:
- **তাফসীর ইবনে কাসীর**
- **হাদীস সংকলন**: সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ ইত্যাদি।

২. **অনুসন্ধান ও সহায়ক গ্রন্থাবলী:**

এই গবেষণায় দাওয়াহ ও তাবলীগের প্রেক্ষাপট, পদ্ধতি ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণে যেসব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে, তা হলো:

- *দাওয়াত সম্পর্কিত ৪০ টি হাদীস* — মুফতি যুবায়ের আহমেদ
- *আল্লাহর পথে দাওয়াত* — ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
- *দাওয়াতের ফিকির ও আমলের ময়দান* — মুফতি যুবায়ের আহমেদ
- *দাওয়াতের ফিকির ও আমলের ময়দান* — হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দীকি সাহেব
- *অমুসলিমদের সাথে রাসূল (সা.)-এর আচরণ প্রসঙ্গ* — ড. রাগীব আস-সারজানী

- *আল্লাহর দিকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের কিছু বাস্তব নমূনা* — সাঈদ ইবন আলী ইবন ওহাফ আল-কাহতানী
- *দ্বীনে হকের প্রতি দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি* — মাওলানা দেলওয়ার হোসেন সাইদী
- *দ্বীনের দাওয়াত* — আব্দুল হামীদ মাদানী

এই সব গ্রন্থ থেকে দাওয়াহর তাৎপর্য, পদ্ধতি, দাঈদের গুণাবলী, নবীদের দাওয়াহ কৌশল, সমাজিক চ্যালেঞ্জ, ও সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্লেষণ, উদ্ধৃতি ও তাত্ত্বিক ভিত্তি গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. **কালগত পরিধি:**

এই গবেষণায় প্রাথমিক যুগ (নবুয়্যতের সময়কাল) থেকে শুরু করে আধুনিক দাওয়াহ আন্দোলনসমূহ (বিশেষ করে তাবলীগ জামাআত) পর্যন্ত সময়কাল বিবেচনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দাওয়াহর বিকাশ ও পদ্ধতির বিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে।

৪. **ভৌগোলিক পরিধি:**

যদিও গবেষণার প্রেক্ষাপট মূলত দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম সমাজ, তবুও এর আলোচনায় ইসলামি দাওয়াহর সার্বজনীনতা ও বৈশ্বিক প্রভাবকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

৫. **গবেষণার সীমাবদ্ধতা:**

- তথ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান সীমিত
- ডিজিটাল দাওয়াহ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাওয়াহের আলোচনা পরিপূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি
- বাংলা অনুবাদ ও কিছু স্মৃতিনির্ভর তথ্যের উপর নির্ভরতা কিছু ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে

এই গবেষণা একটি প্রাঞ্জল, প্রমাণভিত্তিক ও প্রায়োগিক কাঠামো উপস্থাপন করেছে, যা একদিকে দাওয়াহ কর্মীদের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করবে এবং অন্যদিকে ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকদের জন্য একটি মূল্যবান রেফারেন্স হিসেবে বিবেচিত হবে।

অধ্যায় ২: দাওয়াহ ও তাবলীগের ধারণা ও গুরুত্ব

২.১ দাওয়াহর প্রেক্ষাপট ও প্রকারভেদ

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দাওয়াহ হলো এমন একটি গঠনমূলক প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে মানুষকে সঠিক বিশ্বাস ও ন্যায়ের পথে আহ্বান করা হয়। এটি কেবল ধর্মীয় বার্তা পৌঁছানো নয়, বরং মানবতার কল্যাণের একটি ধারাবাহিক আন্দোলন। পবিত্র কুরআনে ও হাদীসে একে একটি মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে। এই দায়িত্ব পালন করা ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মুসলিমের ওপর যেমন আবশ্যক, তেমনি সমষ্টিগতভাবে একটি দল বা গোষ্ঠীর দায়িত্বও বটে।

এই দায়িত্ব দ্বৈত রূপে বর্ণিত—একটি হলো **ফরজে আইন**, যা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য, এবং অন্যটি **ফরজে কিফায়াহ**, যা কিছু সংখ্যক ব্যক্তি পালন করলে সকলের দায়মুক্তি ঘটে। সূরা আল-আসর এবং সূরা আলে ইমরানের আলোকে এ দুটি শ্রেণি বিশ্লেষণ করা হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, দাওয়াহ শুধুমাত্র ধর্মীয় দায়িত্ব নয়; এটি সামাজিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষের হাতিয়ারও বটে।

২.২ তাবলীগ: বাস্তবায়নের ধারা

তাবলীগকে বলা যায় দাওয়াহর অনুশীলনভিত্তিক রূপ, যার মাধ্যমে ইসলামের বাণী কেবল প্রচারেই সীমাবদ্ধ থাকে না—বরং তা মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। এটি নিছক তথ্য প্রচার নয়, বরং আমলের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন। তাবলীগের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অন্যদের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য উপস্থাপন করেন নিজের আচরণ, কথাবার্তা ও জীবনযাপন দ্বারা।

ইমাম আল-গাজ্জালীসহ অনেক ইসলামী চিন্তাবিদের মতে, সত্যিকার তাবলীগ হলো সেই প্রচেষ্টা, যেখানে বাণী ও আচরণ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই কাজ নবীদের উত্তরাধিকার বহন করে এবং সমাজে নৈতিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। তাই দাওয়াহ ও তাবলীগ—উভয়ই পরস্পর পরিপূরক।

২.৩ ইসলামে দাওয়াহ ও তাবলীগের গুরুত্ব

ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা যা মানুষের পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ নিশ্চিত করে, আর এই জীবনবোধের বিস্তার ও প্রচারের অন্যতম প্রধান উপায় হলো দাওয়াহ। এটি কেবল একটি ধর্মীয় কর্ম নয়; বরং এটি আল্লাহর প্রেরিত দায়িত্ব, যা প্রতিটি নবীর জীবনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুয়তের দায়িত্ব লাভ করেন, তখন থেকেই তাঁর মিশন শুরু হয় দাওয়াহর মাধ্যমেই—যেখানে তিনি তাওহীদের আহ্বান দেন, মানুষকে শিরক থেকে বিরত রাখেন এবং মানবতাকে আলো ও মুক্তির পথ দেখান।

২.৪ দাওয়াহ ও তাবলীগের মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ:

ইসলামে দাওয়াহ ও তাবলীগ কেবল কিছু নির্দিষ্ট কাজ নয়, বরং একটি বিস্তৃত ও গঠনমূলক কর্মধারা, যার লক্ষ্য মানবজাতিকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা এবং তাদের জীবনকে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের দিকে পরিচালিত করা। এই প্রচেষ্টার কিছু মৌলিক উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

- **আল্লাহর একত্বের বাণী প্রতিষ্ঠা:** মানুষের হৃদয়ে তাওহীদের দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে তোলা হলো দাওয়াহর প্রধান উদ্দেশ্য। সব নবী-রসূলের দাওয়াহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই একত্ববাদের আহ্বান। মানুষকে শিরক, কুফর ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের দিক নির্দেশনা দেওয়া এর অন্যতম দায়িত্ব।

- **ইসলামের মূল শিক্ষা প্রসার:** কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী আকীদা, আখলাক ও বিধানসমূহ সমাজে প্রচার করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত ও সুন্নাহ মানুষের সামনে তুলে ধরা, যেন তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারে।

- **ব্যক্তিগত জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা**: দাওয়াহ মানুষকে নিজ আত্মার পরিশুদ্ধির পথে আহ্বান করে, যেখানে তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও ভয় নিয়ে জীবন গঠন করে। এতে মানুষের ঈমান মজবুত হয়, আমলে উন্নতি ঘটে এবং তারা পাপ থেকে ফিরে সৎকর্মে প্রবৃত্ত হয়।

- **নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা:** দাওয়াহর মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার, শান্তি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের চর্চা শুরু হয়। অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং সৎকাজে উৎসাহ প্রদান সমাজে স্থায়ী উন্নয়ন ও ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

- **সত্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া:** আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত দাওয়াহর দায়িত্ব হলো মানুষকে যথাযথ পদ্ধতিতে তাঁর পথে আমন্ত্রণ জানানো, যাতে তারা হেদায়েতের আলো গ্রহণ করতে পারে এবং জীবনযাত্রায় তা বাস্তবায়ন করে।

- **নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন:** দাওয়াহ ব্যক্তি চরিত্র গঠনের প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে মানুষ আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত হয় এবং সমাজে একজন সদাচারী নাগরিক হিসেবে আবির্ভূত হয়।
- **ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ:** ইসলামী জ্ঞান, ইতিহাস, কৃষ্টি ও চেতনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। এটি কেবল অতীতের স্মৃতিচারণ নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইসলামী পরিচয় টিকিয়ে রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

- **কল্যাণের দিকে দিকনির্দেশনা**: দাওয়াহর অন্যতম লক্ষ্য হলো মানবজাতিকে কল্যাণ, প্রগতি এবং মুক্তির পথে পরিচালিত করা। এটি দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার সোপান।

- **নবীজির আদর্শ জীবনের প্রতিফলন:** দাওয়াহর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের আদর্শ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তুলে ধরা হয়, যাতে মানুষ তাঁর চরিত্র ও আদর্শকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারে।

- **উম্মাহর ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় করা:** দাওয়াহ কেবল ব্যক্তি উন্নয়নের কাজ নয়; এটি মুসলিম সমাজে পারস্পরিক সহানুভূতি, সহযোগিতা ও ঐক্যের বন্ধনকে শক্তিশালী করে।

- **আখিরাতের জবাবদিহিতার বোধ জাগ্রত করা**: মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে একদিন আল্লাহর কাছে প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে। এই চেতনা একজন মুমিনের জীবনযাত্রাকে আল্লাহভীতির ওপর স্থাপন করে।

দাওয়াহ ও তাবলীগ মানুষকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে এবং তাদের অন্তরে কুরআন-সুন্নাহর প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইসলামী মূল্যবোধ প্রচারের মধ্য দিয়ে সমাজে ন্যায়, শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এটি একটি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র নির্মাণের ভিত গড়ে তুলেছে। সংক্ষেপে বলা যায়, দাওয়াহ ও তাবলীগ হলো আল্লাহর দীনকে প্রসারিত করার অন্যতম কার্যকর পন্থা, যা একদিকে যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম, অন্যদিকে মানবকল্যাণের ধারক। যারা এই কাজে আত্মনিয়োগ করে ও সকল প্রতিকূলতায় ধৈর্য ধারণ করে, তারাই প্রকৃত মুত্তাকী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ।

অধ্যায় ৩: কুরআনে দাওয়াহ ও তাবলীগের নির্দেশনা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানবজাতির কল্যাণে প্রেরিত। এটি কেবল ইবাদত ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো "দাওয়াহ" — আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করা। এই আহ্বানের ধারাবাহিকতা এবং গঠনমূলক প্রচেষ্টাই রূপ নিয়েছে একটি সুশৃঙ্খল আন্দোলনে, যাকে বলা হয় "তাবলীগ"। দাওয়াহ ও তাবলীগ কেবল ব্যক্তিগত নয়; বরং সমাজিক, নৈতিক ও আত্মিক জাগরণের অন্যতম প্রধান উপাদান। এই অধ্যায়ে আমরা পবিত্র কুরআনের আলোকে দাওয়াহ ও তাবলীগের দিকনির্দেশনা, নীতি ও পদ্ধতি বিশ্লেষণ করবো।

দাওয়াহর তাৎপর্য ও কুরআনিক নির্দেশনা:
ইসলামী পরিভাষায় দাওয়াহ শব্দের মানে হলো মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেওয়া, তাওহীদের দিকে আহ্বান জানানো এবং তাদেরকে ইসলামের সঠিক জ্ঞান পৌঁছে দেওয়া। দাওয়াহর প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষের হৃদয়ে ঈমানের বীজ বপন করা, যাতে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলতে উদ্বুদ্ধ হয়।

পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে দাওয়াহর গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। সূরা আলে ইমরান (৩:১০৪) এ বলা হয়েছে:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

“তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানাবে, সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। তারাই সফলকাম।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৪)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে দাওয়াহ শুধু ব্যক্তিগত দায়িত্ব নয়; বরং একটি সামষ্টিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব, যা একটি উম্মত হিসেবে মুসলমানদের পালন করা উচিত। যারা এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে, তারাই প্রকৃত সফল।

শ্রেষ্ঠ কর্ম হিসেবে দাওয়াহ:

আল্লাহ তায়ালা সূরা ফুসসিলাত (৪১:৩৩) এ বলেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

"আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াহ দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'?"

তাফসির ইবনে কসীর অনুযায়ী, এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহর পথে দাওয়াহ দেওয়া, নিজে সৎকর্মে রত থাকা এবং দ্বিধাহীনভাবে ইসলামী পরিচয় ঘোষণা করা একজন মুমিনের শ্রেষ্ঠতম কাজ। এটি নবীদের আদর্শ এবং প্রতিটি দাঈর জন্য অনুসরণীয় পথ।

— তাফসির ইবনে কসীর, সূরা ফুসসিলাত, আয়াত ৩৩

দাওয়াহর কৌশল: হিকমাহ ও উত্তম উপদেশ

দাওয়াহ কেবল কথা বলার বিষয় নয়; এটি একটি কৌশলগত ও জ্ঞাননির্ভর কর্ম। সূরা আন-নাহল (১৬:১২৫) এ বলা হয়েছে:

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

"আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন হিকমাহর মাধ্যমে, উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক ভাল জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন কারা সৎপথে রয়েছে।"

— সূরা আন-নাহল (১৬:১২৫)

এই আয়াত দাওয়াহ’র তিনটি মূলনীতি নির্ধারণ করেছে: হিকমাহ (প্রজ্ঞা), মওইযা হাসানাহ (উত্তম উপদেশ) এবং জিদাল (উপযুক্ত বিতর্ক)। এসব ব্যবহার করে দাঈ ব্যক্তি মানুষের মন জয় করে সত্যের দিকে আহ্বান করে।
— তাফসির ইবনে কসীর, সূরা আন-নাহল, আয়াত ১২৫

দাওয়াহ: ব্যক্তি ও সমষ্টিগত দায়িত্ব:

সূরা আল-আসরের সংক্ষিপ্ত আয়াতেও দাওয়াহর গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে:
وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ

আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-আসরে ইরশাদ করেন:
“সময়ের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।” (সূরা আল-আসর, আয়াত ১–৩)

তাফসির ইবনে কসীর অনুযায়ী, এই সূরায় দাওয়াহর মূল চারটি স্তম্ভ বর্ণিত হয়েছে—ঈমান, সৎকর্ম, সত্যের দাওয়াহ এবং ধৈর্য। বিশেষ করে "তাওয়াসাউ বিল হাক্ক" (সত্যের উপদেশ দেওয়া) অংশটিই দাওয়াহর আবশ্যকতা ও গুরুত্বকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে।
— তাফসির ইবনে কসীর, সূরা আল-আসর (১০৩)

এই চারটি গুণের মধ্যে 'সত্যের উপদেশ দেওয়া' সরাসরি দাওয়াহর অন্তর্ভুক্ত। ফলে এটি প্রতিটি মুমিনের ব্যক্তিগত দায়িত্ব বা ফরজ আইন। অন্যদিকে, সমাজের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মাধ্যমে দাওয়াহ বাস্তবায়িত হওয়াকে বলা হয় ফরজ কিফায়া, যেমন সূরা আলে ইমরানের আয়াতে বলা হয়েছে।

তাওহীদের দাওয়াহ: নবীগণের মিশনের মূলনীতি:

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন, প্রতিটি জাতির মাঝে রাসূল পাঠানো হয়েছে, যেন তারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাগুত (মিথ্যা শক্তি) থেকে বিরত থাকে। সূরা আন-নাহলের ৩৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَٰلَةُ ۚ فَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

"আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ কাউকে হিদায়াত দিয়েছেন এবং তাদের মধ্য থেকে কারো উপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর অতঃপর দেখ, অস্বীকারকারীদের পরিণতি কীরূপ হয়েছে।" (সূরা আন-নাহল, ১৬:৩৬)

ইবনে কসীর (রহ.) ব্যাখ্যা করেন, এই আয়াত প্রমাণ করে যে দাওয়াহ ছিল সব নবীর প্রধান দায়িত্ব এবং তাওহীদ ছিল তাঁদের আহ্বানের কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিটি জাতির মধ্যে দাওয়াতি দায়িত্ব অর্পণ করে আল্লাহ তাআলা প্রমাণ করেছেন—এটি কোনো ঐতিহাসিক পর্ব নয়, বরং একটি চিরন্তন দায়িত্ব।

— তাফসির ইবনে কসীর, সূরা আন-নাহল, আয়াত ৩৬

নবীদের প্রেরণের অন্যতম লক্ষ্য ছিল, মানুষের প্রতি আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেওয়া, যাতে কিয়ামতের দিন কেউ কোনো অজুহাত দিতে না পারে। সূরা আন-নিসার ১৬৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"আর (পাঠিয়েছি) রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে আল্লাহর বিপক্ষে রাসূলদের পর মানুষের জন্য কোন অজুহাত না থাকে। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৬৫)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতিকে সুস্পষ্ট বার্তা প্রদান করা, যাতে তারা হেদায়েতের সুযোগ পায় এবং কিয়ামতের দিন কোনো অজুহাত দিতে না পারে।

একই রকম কথা এসেছে সূরা ত্বা-হার ১৩৪ নম্বর আয়াতেও, যেখানে বলা হয়েছে, রাসূল প্রেরণের পূর্বে শাস্তি দিলে মানুষ অভিযোগ করতে পারত
وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَٰهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِۦ لَقَالُوا۟ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ

আল্লাহ তাআলা বলেন—
“আর যদি আমি তাদেরকে ইতঃপূর্বে কোন আযাব দ্বারা ধ্বংস করতাম তবে অবশ্যই, তারা বলত, ‘হে আমাদের রব, আপনি আমাদের কাছে কোন রাসূল পাঠালেন না কেন? তাহলে তো আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বে আপনার নিদর্শনাবলী অনুসরণ করতাম’।” (সূরা ত্বা-হা, আয়াত ১৩৪)
এই আয়াত মানবজাতির জন্য আল্লাহর রহমত ও হেদায়েতের নিদর্শন। নবীদের প্রেরণ শুধুমাত্র মানুষের জন্য শাস্তি থেকে রক্ষা নয়, বরং তাদের জন্য সৎপথের নির্দেশনা, যাতে তারা কোনো অজুহাত না খুঁজে পায়। নবীদের দাওয়াহ ছিল প্রতিটি জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট বরকত।
এ সব আয়াত দাওয়াহের গুরুত্ব এবং আমাদের দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করে। আজকের সমাজে দাওয়াহি কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে জাতিগতভাবে এর পরিণতি ভোগ করতে হতে পারে। অন্যদিকে, এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আমরা শুধু অন্যদের নয়, নিজেদের ও নিজেদের পরিবারেরও মুক্তির পথ তৈরি করতে পারি।

দাওয়াহ ও তাবলীগের জন্য কুরআনের মূল নীতিমালা:

আল-কুরআনে দাওয়াহ ও তাবলীগের জন্য সুস্পষ্ট ও গভীরদর্শী একাধিক নীতিমালা তুলে ধরা হয়েছে, যা প্রতিটি দাঈর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত। এই নীতিমালাগুলো কেবল বক্তব্য দেওয়ার কৌশল নয়, বরং

তা এক পূর্ণাঙ্গ আদর্শ জীবনচর্যার দিকনির্দেশনা। নিচে কুরআনের আলোকে দাওয়াহ সম্পর্কিত প্রধান নীতিগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

হিদায়াত দেওয়া আল্লাহর কাজ, দাঈর কাজ শুধু বার্তা পৌঁছানো

তাবলীগ করতে গিয়ে দাঈর মনে রাখতে হবে যে, মানুষের অন্তর পরিবর্তন করা তার কাজ নয়। আল্লাহ তায়ালা সূরা আন'আমে ইরশাদ করেন:

"তারা তো আপনাকে মিথ্যা বলছে না, বরং তারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করছে। আর আপনি তাদের উপর দায়িত্বপ্রাপ্ত নন।"
— (সূরা আন'আম: ৩৫-৩৬)

এমনকি নবী (সাঃ) -কেও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, হিদায়াত দেওয়া তাঁর কাজ নয়, বরং আল্লাহ যার জন্য চান, তাকেই হিদায়াত দেন:

"এটি তো কেবল উপদেশ। তোমাদের মধ্যে যে চায় সে সৎপথ অবলম্বন করবে। আর তোমরা ইচ্ছাও করতে পারবে না, যদি না আল্লাহ চান।"
— (সূরা তাকভীর: ২৭-২৯)

হিকমাহ ও মাও'ইযাহ হাসানাহর মাধ্যমে দাওয়াহ

আল্লাহ বলেন:
"তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে হিকমাহ এবং মাও'ইযাহ হাসানাহর মাধ্যমে আহ্বান করো।"
(সূরা নাহল: ১২৫)

হিকমাহ অর্থ হচ্ছে প্রজ্ঞা, বাস্তবতা অনুধাবন করে যুক্তিনির্ভরভাবে কাউকে ইসলামের পথে আহ্বান করা। অন্যদিকে, "মাও'ইযাহ হাসানাহ" বা সুন্দর

উপদেশ বলতে বোঝায় হৃদয়ছোঁয়া, সহানুভূতিশীল এবং ইতিবাচক ভঙ্গিতে উপদেশ প্রদান।

একজন দাঈর উচিত প্রতিটি মানুষের মানসিকতা, ধর্মীয় জ্ঞান, সামাজিক অবস্থান ও সংস্কৃতি বুঝে তার উপযোগী পদ্ধতিতে দাওয়াহ প্রদান। কঠোরতা কিংবা তুচ্ছতা নয়, বরং হৃদয়স্পর্শী ভাষা, দৃষ্টান্ত ও যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যার মাধ্যমে আহ্বানই কুরআনিক নির্দেশ।

দাওয়াতে কোমলতা ও নম্রতা অপরিহার্য

আল্লাহ বলেন:

“তুমি যদি কঠোর ও রূঢ় হৃদয় হতে, তবে তারা তোমার চারপাশ থেকে সরে যেত।”

(সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)

দাওয়াহর ক্ষেত্রে রূঢ়তা মানুষকে বিভ্রান্ত বা প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলে। একজন দাঈর উচিত মানুষের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার সময় নরম ভাষায় এবং সহানুভূতির সাথে তা বলা। নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনে এমন বহু ঘটনা আছে—যেখানে সাহাবিদের ভুল বা মুশরিকদের কটূক্তি তিনি সহিষ্ণুতা দিয়ে মোকাবেলা করেছেন।

মুসা (আ.) এবং হারুন (আ.)-কে আল্লাহ ফিরআউনের মতো শত্রু শাসকের কাছেও "নরম কথা বলো" এই নির্দেশ দেন (সূরা তোয়াহা: ৪৪)। এটা প্রমাণ করে—দাওয়াহর প্রধান শর্ত কোমলতা।

ধৈর্য ও সহনশীলতা: নবীগণের পথ

আল্লাহ বলেন:

“নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণরূপে দেওয়া হবে সীমাহীনভাবে।”

(সূরা যুমার: ১০)

দাওয়াহর পথে বিপদ আসবেই—অবজ্ঞা, কটূক্তি, নিগ্রহ এমনকি আত্মীয়দের বিরোধিতা। কিন্তু নবী ও রাসূলরা কখনো পিছপা হননি।

- নূহ (আ.) ৯৫০ বছর দাওয়াহ দিয়ে মাত্র অল্প কিছু মানুষকে ঈমানে ফিরিয়েছিলেন।
- ইব্রাহিম (আ.) নিজের পিতাকে বারবার দাওয়াহ দিয়েও প্রত্যাখ্যাত হন।
- রাসূলুল্লাহ (সা.) তায়েফে পাথর আঘাতে রক্তাক্ত হলেও তাদের জন্য দোয়া করেন।

সুতরাং, একজন দাঈর জন্য ধৈর্য শুধু প্রয়োজন নয়—বরং তা অবিচ্ছেদ্য।

জ্ঞান অর্জন ও প্রমাণভিত্তিক দাওয়াহ

আল্লাহ বলেন:
"বলুন: এই আমার পথ—আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান করি জ্ঞানসহ।"
(সূরা ইউসুফ: ১০৮)

অজ্ঞতার ভিত্তিতে দাওয়াহ বিভ্রান্তি ডেকে আনে। আজকের দিনে দাওয়াহ দিতে হলে একজন দাঈর কুরআন, হাদীস, ফিকহ, ইতিহাস এবং আধুনিক চিন্তাধারার সাথেও পরিচিত থাকা জরুরি। একজন প্রকৃত দাঈ জ্ঞানে সুদৃঢ় হবেন এবং সেই জ্ঞান নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করবেন।

দাওয়াহর উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি

আল্লাহ বলেন:
"তারা আদিষ্ট হয়েছিল একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য, একনিষ্ঠভাবে।"
(সূরা বাইয়্যিনাহ: ৫)

দাওয়াহর ক্ষেত্রে ইখলাস বা একনিষ্ঠতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আত্মপ্রদর্শন, সামাজিক খ্যাতি বা কোন পার্থিব লাভের উদ্দেশ্যে দাওয়াহ করলে তা আল্লাহর নিকট কবুল হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো দাওয়াহর বিনিময়ে উপহার বা প্রতিদান নেননি। বরং তাঁর কথা ছিল:

"আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, এটি তো গোটা জাহানের জন্য এক উপদেশ।" (সূরা আনআম: ৯০)

কথায় ও কাজে সামঞ্জস্যতা থাকা

আল্লাহ বলেন:

"তোমরা যা কর না, তা কেন বলো?"

(সূরা আস-সফ: ২-৩)

একজন দাঈর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তিনি যা বলছেন—নিজে তা পালন করছেন কিনা। মানুষের দৃষ্টিতে দ্বিচারিতা মারাত্মক ক্ষতিকর। বক্তা যদি মানুষকে নেক কাজের দাওয়াহ দেন অথচ নিজেই তা করেন না, তাহলে তার দাওয়াহ প্রভাব হারায়।

ইসলামের ইতিহাসে বহু দাঈ ও আলিম তাঁদের সাদৃশ্যপূর্ণ জীবনযাপনের কারণে মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন।

দাওয়াহে জোর-জবরদস্তি নয়

আল্লাহ বলেন:

"ধর্মে কোনো জোর নেই।"

(সূরা বাকারা: ২৫৬)

ইসলামে দাওয়াহ মানে কাউকে বাধ্য করা নয়; বরং যুক্তির আলোকে, হৃদয়গ্রাহী উপায়ে মানুষকে আহ্বান করা। কুরআন সকল মানুষের জন্য পথনির্দেশনা, কিন্তু গ্রহণের স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই রয়েছে।

অগ্রাধিকারবোধ ও সময়োপযোগিতা

সূরা ‘আবাসা’তে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) একজন বড় কুরাইশ নেতার দিকে মনোযোগী হয়ে অন্ধ সাহাবিকে অগ্রাধিকার দেননি—এবং এ বিষয়ে কুরআন তাঁকে সতর্ক করেছে।

এ থেকে শিক্ষা: যারা দাওয়াহ পেতে আগ্রহী, তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। দাওয়াহর ক্ষেত্রেও সময় ও প্রেক্ষাপট বুঝে এগোতে হবে।

মতবিরোধে কুরআন ও সুন্নাহকে ভিত্তি করা

আল্লাহ বলেন:

“তোমরা যদি কোনো বিষয়ে মতভেদ করো, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।”

(সূরা নিসা: ৫৯)

দাওয়াহর ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিলেও তা ব্যক্তিগত অভিমানে নয়, বরং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমাধান করতে হবে।

দাওয়াহ হলো এক মহান ইবাদত ও নবীদের উত্তরাধিকার। এটি শুধু মুখের আহ্বান নয়—বরং আমল, আচরণ, হৃদয় থেকে উৎসারিত আন্তরিকতার সংমিশ্রণ। কুরআনের আলোকে পরিচালিত দাওয়াহ মানবজাতির জন্য রহমত হয়ে ওঠে। একজন দাঈ যখন এই নীতিগুলো ধারণ করেন, তখন তার দাওয়াহ সত্যিকারের আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

অধ্যায় ৪: হাদীসের আলোকে দাওয়াহ ও তাবলীগ

ইসলামের দুটি প্রধান উৎস হলো কুরআন ও হাদীস। কুরআন মহান আল্লাহর বাণী, আর হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, কার্যকলাপ ও মৌন অনুমোদনের সমষ্টি। হাদীস ইসলামী জীবনব্যবস্থার বাস্তবিক দিক নির্দেশ করে এবং দাওয়াহ ও তাবলীগের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ ধারণা প্রদান করে। এটি কেবল কুরআনের ব্যাখ্যা নয়, বরং নবীজি (সা.) ও তাঁর সাহাবাদের মাধ্যমে এই দাওয়াহি কাজ কীভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করে। এই অধ্যায়ে আমরা হাদীসের আলোকে দাওয়াহ ও তাবলীগের মৌলিক দিকগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো।

৪.১ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ মিশন

নবুওয়াত লাভের পর থেকেই রাসূলুল্লাহ (সা.) মানবজাতিকে তাওহিদের পথে আহ্বান করার মহান দায়িত্ব পালন শুরু করেন। তাঁর দাওয়াহ জীবন মক্কা ও মাদীনার দুই পর্যায়ে বিভক্ত।

মক্কায় দাওয়াহর সূচনা ও পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন:

১. গোপন পর্যায় (প্রথম তিন বছর):

প্রাথমিকভাবে দাওয়াহ গোপনভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সময় তিনি নিকটজনদের মধ্যে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেন। খাদীজা (রা.), আলী (রা.), আবু বকর (রা.) ও যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। এই পর্বের দাওয়াহ ছিল ব্যক্তিগত সম্পর্ক, আস্থা ও অন্তরঙ্গ আলাপের মাধ্যমে পরিচালিত।

২. প্রকাশ্য দাওয়াহ:

আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী, রাসূল (সা.) পরবর্তীতে সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে কুরাইশ সম্প্রদায়ের সবাইকে প্রকাশ্যে সতর্ক করেন। তিনি বলেন, “হে কুরাইশ! আমি কি তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী নই?” এই আহ্বানে শুরু হয় চরম

বিরোধিতা, শারীরিক নির্যাতন ও সামাজিক বয়কট। তাঁর সাহসিকতা, ধৈর্য ও অবিচলতা এখানেই স্পষ্ট।

দাওয়াহ মিশনের বৈশিষ্ট্য ও কৌশলসমূহ

১. ধৈর্য ও অবিচলতা:

শত্রুতা ও নির্যাতনের মাঝেও রাসূল (সা.) দাওয়াহ এর কাজ চালিয়ে যান। কুরআনে বহুবার তাঁকে ধৈর্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা আসরে বলা হয়েছে, "তারা একে অপরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।" এক দাঈর জন্য এটি অপরিহার্য গুণ।

২. জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ব্যবহার:

রাসূল (সা.) সর্বদা জ্ঞান ও হিকমাহর মাধ্যমে দাওয়াহ করেছেন। কুরআনের নির্দেশ অনুসারে, "তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমাহ ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।" অজ্ঞতা দাওয়াহর পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা। হাদীসেও বলা হয়েছে, "জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।"

৩. উত্তম চরিত্র ও কোমলতা:

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চারিত্রিক গুণ ছিল মানুষের অন্তর জয় করার প্রধান মাধ্যম। তিনি কখনও কঠোর বাক্য ব্যবহার করতেন না। একবার এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করলে, সাহাবারা তাকে থামাতে চাইলে রাসূল (সা.) বাধা দেন এবং পরে খুব শান্তভাবে তাকে বুঝিয়ে দেন। এ ধরনের ঘটনা তাঁর দাওয়াহর নম্রতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

৪. আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা:

সব বাধা ও প্রতিকূলতার মাঝেও তিনি কখনও ভেঙে পড়েননি। তিনি জানতেন, দায়িত্ব শুধু বার্তা পৌঁছানো; হেদায়েত দেওয়া আল্লাহর কাজ। তাঁর সাহস ও আত্মবিশ্বাস আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতারই ফসল।

৫. বহুমাত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার:

তিনি কেবল মুখের ভাষা নয়, চিঠির মাধ্যমে রাজা-বাদশাহদের দাওয়াহ পাঠিয়েছেন। এই বহুমাত্রিকতা বর্তমান যুগেও প্রযোজ্য। এখনকার মিডিয়া, প্রযুক্তি, সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম দাওয়াহের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

৬. সামাজিক পরিবর্তন আনা:

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহর প্রভাবে সমাজে গভীর পরিবর্তন আসে। জাহেলিয়াতের কুপ্রথা বিলুপ্ত হয়, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সামাজিক সম্পর্কের নতুন ভিত্তি তৈরি হয়।

৭. মানবতার প্রতি ভালোবাসা:

তিনি কেবল মুসলিমদের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। একজন দাঈর উদ্দেশ্য কেবল ধর্ম প্রচার নয়; বরং আল্লাহর সৃষ্টিকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা।

৮. সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা:

দাওয়াহের সফলতার অন্যতম ভিত্তি হলো দাঈর ব্যক্তিত্ব। রাসূল (সা.) ছিলেন আল-আমীন (বিশ্বস্ত)। প্রতিশ্রুতি পূরণ ও সত্যবাদিতার কারণে কাফেররাও তাঁর চরিত্রের প্রশংসা করত।

মাদীনায় দাওয়াহর প্রসার

মক্কার কঠিন সময় পেরিয়ে মাদীনায় আসার পর দাওয়াহর একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়। আকাবার বাইয়াতের মাধ্যমে মদীনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করে এবং একটি সংগঠিত ইসলামী সমাজ গঠিত হয়। এই সময়ে ইসলাম রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এখানে দাওয়াহকে কেবল ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়েও প্রসারিত করেন।

৪.২ হাদীসভিত্তিক দাওয়াহ ও তাবলীগ

১. দাওয়াহ'র গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামের দৃষ্টিতে দাওয়াহ শুধু এক ব্যক্তির দায়িত্ব নয়; বরং এটি গোটা উম্মতের ওপর আরোপিত সম্মিলিত দায়িত্ব। হাদীস শরীফে স্পষ্ট বলা হয়েছে, যে সমাজ দাওয়াহর দায়িত্ব ভুলে যায়, সেখানে আল্লাহর রহমত কমে যায় এবং শাস্তির পূর্বাভাস শুরু হয়। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন:

"তোমরা অবশ্যই সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে, অন্যথায় এমন সময় আসবে যখন তোমরা দোয়া করলেও তা কবুল হবে না।"
— (ইবনেমাজা-৪০০৪)

এই হাদীস আমাদের দাওয়াহর গুরুত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করে। দাওয়াহ না থাকলে সমাজে অন্যায়, পাপ ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে, যা ধীরে ধীরে গোটা জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। তাই দাওয়াহ কেবল কোনো সংস্থা বা বিশেষ দলের কাজ নয়, এটি প্রতিটি সচেতন মুসলিমের দায়িত্ব, যার মাধ্যমে সমাজে নৈতিকতা, সহানুভূতি এবং আল্লাহভীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. দাওয়াহর পদ্ধতি ও ধাপসমূহ

দাওয়াহ প্রদানে হঠাৎ আবেগতাড়িত হয়ে কাজ করলে বরং ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি থাকে। নবীজী ﷺ দাওয়াহর পদ্ধতি শিখিয়েছেন ধাপে ধাপে, মানুষের মানসিকতা ও গ্রহণযোগ্যতার মাত্রা বুঝে। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় রাসূল ﷺ বলেন:

“তুমি এমন এক জাতির কাছে যাচ্ছ যারা আহলে কিতাব। সুতরাং তাদেরকে প্রথমে তাওহীদের দিকে ডাকো— ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই’— যদি তারা গ্রহণ করে, তাহলে তাদের জানাও যে আল্লাহ তাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন।”

— (বুখারি ও মুসলিম)

এই হাদীসে দাওয়াহ'র কৌশলগত গভীরতা ফুটে উঠেছে। প্রথমে আকীদা, তারপর ইবাদত—এ ধাপে ধাপে উপস্থাপন করার মাধ্যমেই মানুষ ধীরে ধীরে ইসলামের সৌন্দর্য অনুভব করতে পারে। এতে প্রতিফলিত হয়, একজন দাঈকে কেবল জ্ঞানী নয়, কৌশলী ও ধৈর্যশীলও হতে হয়।

৩. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ

দাওয়াহর মূল উপাদান হলো "আমর বিল মারুফ ও নহি আনিল মুনকার"—সৎকাজে উৎসাহ প্রদান ও মন্দ কাজে প্রতিবাদ। এটি এমন এক নীতিগত দায়িত্ব, যা ইসলামকে কেবল ব্যক্তিগত ধর্ম নয়, বরং সামাজিক সুব্যবস্থার মূল উৎসে পরিণত করেছে। নবী করীম ﷺ বলেন:

"তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে তা হাত দ্বারা প্রতিহত করুক; যদি না পারে, মুখ দ্বারা প্রতিবাদ করুক; আর তাও না পারলে, অন্তরে ঘৃণা করুক—এটিই সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।"
— (সহীহ মুসলিম)

এই হাদীস তিনটি স্তরে দাওয়াহর বাস্তবায়ন দেখায়—শক্তির প্রয়োগ, বাকশক্তির প্রয়োগ, এবং মনোভাবের দৃঢ়তা। এর মধ্যে অন্তরের অবস্থানকেও হাদীস গুরুত্ব দিয়েছে, যা বোঝায়—দাওয়াহ শুধু বাহ্যিক নয়, এটি আত্মিক প্রতিবাদও হতে পারে। এই হাদীস সমাজকে দায়বদ্ধ করে প্রতিটি মুসলমানকে দায়িত্বশীলভাবে পরিবেশ গঠনে অংশ নিতে।

৪. দাওয়াহকারীর গুণাবলী ও দৃষ্টিভঙ্গি

দাওয়াহ দাতার চরিত্র ও ভাষা, তার জ্ঞানের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একজন দাঈ যদি কঠোর, গর্বিত বা অসংবেদনশীল হয়, তবে তার কথার প্রভাব নষ্ট হয়ে

যায়। নবী ﷺ নিজে ছিলেন শ্রেষ্ঠ দাঈ, আর তিনি সবসময় দাওয়াতে হিকমাহ, নম্রতা ও ধৈর্য অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেন:

“আমি তো একজন পৌঁছিয়ে দিচ্ছি, আর হেদায়েত দেওয়ার মালিক আল্লাহ। আমি তো বণ্টন করি, আর আল্লাহ দেন।”
— (মুসলিম)
এই হাদীস দাওয়াহর সফলতা কারো ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নয়, বরং আল্লাহর ইচ্ছায় নির্ভরশীল তা স্পষ্ট করে। তাই একজন দাঈ যেন কখনো অহংকারী না হয়; তার কাজ বার্তা পৌঁছে দেওয়া, হেদায়াত দেওয়া আল্লাহর ইচ্ছায় নির্ধারিত। দাঈর গুণ হওয়া উচিত—সহনশীলতা, গভীর জ্ঞান, আন্তরিকতা ও বিনয়।

৫. রাসূল ﷺ-এর দাওয়াতি নির্দেশনাবলি
রাসূল ﷺ তাঁর উম্মতকে দাওয়াহর গুরুত্ব বুঝিয়ে বলে গেছেন:

“তোমরা উপস্থিত ব্যক্তিরা অনুপস্থিতদের কাছে আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, হয়ত অনেকেই এমন কথা পৌঁছে দিবে, যারা তা শ্রোতা অপেক্ষা ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবে।”
— (বুখারি ও তিরমিজি)

এটি দাওয়াহর একটি মহান নির্দেশ—‘বাল্লিগু আন্নি ওয়া লাউ আয়াহ’। অর্থাৎ, যতটুকু জানো, ততটুকুই পৌঁছে দাও। এখানে দ্বীন প্রচারে জ্ঞানীর পাশাপাশি সাধারণ মুসলিমদেরও ভূমিকা আছে। কারো কাছে হয়তো শুধু একটি আয়াতের জ্ঞান আছে, কিন্তু সেটিই কারো জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে।

উপরোক্ত হাদীসসমূহ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, দাওয়াহ ও তাবলীগ ইসলামের একটি কেন্দ্রীয় দিক। এটি শুধু ইলম নয়, বরং আমল, মনোভাব এবং উদ্দেশ্যেরও বিষয়। হাদীস আমাদের শিখিয়েছে—প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী দাওয়াহ দিতে

হবে, হিকমাহ ও সদ্ভাব বজায় রেখে। আর এ দায়িত্ব কেবল আলেম বা দাঈদের নয়, বরং প্রতিটি ঈমানদারের। যারা এই দায়িত্ব বুঝে ও পালন করে, তারাই সফল—দুনিয়া ও আখিরাতে।

অধ্যায় ৫: দাওয়াহ ও তাবলীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দাওয়াহ ও তাবলীগ ইসলামের অন্যতম মৌলিক ও অপরিহার্য কাজ, যার মূল উদ্দেশ্য মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুইটি কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং তা কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত।

এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ কেবল ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা সমাজ ও গোটা মানবজাতির কল্যাণে প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তিগত আত্মশুদ্ধি থেকে শুরু করে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জাগরণ, সামাজিক সচেতনতা, এবং বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এর পরিধি বিস্তৃত।

১. তাওহীদ প্রচার: দাওয়াহর মৌলিক ভিত্তি

দাওয়াহ ও তাবলীগের প্রধান ও সর্বাগ্রে উদ্দেশ্য হলো তাওহীদের আহ্বান — অর্থাৎ আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন এবং কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত করা। ইসলামের মূল ভিত্তি এই তাওহীদ, যা প্রতিটি নবী ও রাসূলের দাওয়াহ'র কেন্দ্রবিন্দু ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ পরিবার ও আত্মীয়দের কাছে প্রথমেই এই আহ্বান পৌঁছে দেন যে, সম্পর্ক কেবল সেই ব্যক্তিদের সঙ্গেই হবে যারা আল্লাহ ও রিসালাতে ঈমান আনে।

মক্কার কুরাইশরা তাঁকে তাওহীদের দাওয়াহ থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিল, যা প্রমাণ করে — তাঁর দাওয়াহ'র মূল ছিল এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান। কুরআনে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন, "আমি প্রত্যেক জাতির কাছে একজন রাসূল পাঠিয়েছি এই বার্তা দিয়ে: 'তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে বিরত থাকো।'" (সূরা নাহল ১৬:৩৬)।

তাগুত বলতে বুঝায় এমন সকল শক্তিকে, যারা আল্লাহর পরিবর্তে উপাসনার পাত্র হয়ে দাঁড়ায় বা তাঁর আনুগত্য থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে। কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও তাওহীদকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন সূরা বাইয়্যিনাহ ও সূরা কাহাফে, যেখানে মুমিনদের আল্লাহর ইবাদতে নিষ্ঠাবান থাকার এবং শিরক থেকে বাঁচার কথা বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মু'আয ইবনে জাবাল রা. কে ইয়েমেনে প্রেরণের সময় নির্দেশ দিয়েছিলেন, "তুমি প্রথমেই মানুষকে সাক্ষ্য দিতে বলো যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রাসূল।" এরপর সালাত ও যাকাতের কথা বলা হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায়, তাওহীদ শুধুমাত্র দাওয়াহর সূচনা নয়, বরং তা ইসলামের অন্যান্য ইবাদতের ভিত্তিও।

তাওহীদ প্রচারে নবীদের প্রেরিত হওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী করে তোলা এবং তাদেরকে শিরক থেকে দূরে রাখা। নবী ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন কারাগারে তাঁর সঙ্গীদের দাওয়াহ দেন, তখনও তিনি প্রথমে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এক আল্লাহর প্রতি এবং তাদের জিজ্ঞাসা করেন, "বহু উপাস্য উত্তম, না একমাত্র প্রবল পরাক্রমশালী আল্লাহ?" এই প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি তাওহীদের দাওয়াহ'র তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

২. ঈমান ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

তাওহীদের পাশাপাশি ঈমানের অন্যতম স্তম্ভ হলো সমস্ত রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন। কুরআনে পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনী বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা সকল রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেন এবং তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করার নির্দেশ দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং এই শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাঁর দাওয়াহ'র একটি অংশ ছিল পূর্ববর্তী নবীদের অনুসরণে মানুষকে আহ্বান জানানো।

এই বিশ্বাস মানুষকে আল্লাহর প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি গভীর আস্থা ও আত্মসমর্পণে উদ্বুদ্ধ করে। একজন প্রকৃত মুমিন

যখন ঈমানের পরিপূর্ণতা অর্জন করেন, তখন তার অন্তরে আল্লাহভীতি জন্ম নেয়, যা মানুষকে গোনাহ থেকে রক্ষা করে এবং নেক আমলে অগ্রসর হতে সাহায্য করে।

৩. নেক আমলের প্রতি আহ্বান

তাওহীদের পর দাওয়াহ ও তাবলীগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো সৎকর্মে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। ইসলাম বিশ্বাস ও আমলের সমন্বিত একটি জীবনব্যবস্থা। কুরআনে বহুবার "যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে" — এই বাক্যাংশ একত্রে এসেছে, যা স্পষ্ট করে যে ঈমান ও সৎকাজ একে অপরের পরিপূরক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মু'আয রা. কে দাওয়াহ দিতে বলার সময় প্রথমে তাওহীদ, এরপর সালাত, তারপর যাকাতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সূরা বাইয়্যিনাহ এবং সূরা কাহ্ফ-সহ অনেক আয়াতে সালাত কায়েম, যাকাত প্রদান এবং নেক আমলের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

সূরা লোকমানে যেমন বলা হয়েছে, "হে আমার প্রিয় সন্তান, তুমি সালাত কায়েম করো, সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখো।" এছাড়াও সূরা মায়েদার আয়াতে সৎকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করার নির্দেশ রয়েছে, যা দাওয়াহ'র সামাজিক দিককে তুলে ধরে।

৪. নানাবিধ নেক আমলের পরিসর

দাওয়াহ কেবল সালাত, যাকাত, রোজার মতো ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং সুন্নাহ পালন, সুদ থেকে বিরত থাকা, সদাচার, গরীব-দুঃখীর সাহায্য, এবং গাফেল মনকে জাগ্রত করা— সবই দাওয়াহ'র অন্তর্ভুক্ত।
ইমাম আবু হানিফা রাহ. তাঁর ছাত্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকাই হচ্ছে দাওয়াহ'র মূল কথা। আর এর শিকড় হচ্ছে এক আল্লাহর ইবাদত করা ও শিরক থেকে মুক্ত থাকা।"

দাওয়াহ ও তাবলীগ শুধু কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির দায়িত্ব নয়; বরং এটি প্রতিটি মুসলমানের ওপর আরোপিত একটি দায়িত্ব, যার মাধ্যমে সমাজে নৈতিকতা, ঈমান, এবং ইসলামী আদর্শ ছড়িয়ে পড়তে পারে। এটি কেবল ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের একটি মাধ্যম নয়; বরং মানবতার কল্যাণে একটি বহুমাত্রিক কর্মসূচি। তাই দাওয়াহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করা, এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করাই একজন দাঈর কর্তব্য।

অধ্যায় ৬: দাওয়াহ ও তাবলীগের প্রধান বৈশিষ্ট্য

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যা আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবজাতির জন্য মনোনীত করেছেন । এই শ্রেষ্ঠ দ্বীনের বার্তা পৌঁছে দেওয়া প্রতিটি মুসলিমের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব—যা কুরআন-হাদীসের ভাষায় পরিচিত 'দাওয়াহ ইলাল্লাহ' নামে । যারা এই দায়িত্ব পালন করে, তারা 'দাঈ' নামে অভিহিত হন । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন দাওয়াহর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাঁর পদ্ধতি ও নীতি অনুসরণ করাই প্রতিটি দাঈর জন্য অপরিহার্য ।

মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করার এ মহান কাজ সফলভাবে সম্পাদনের জন্য দাঈর মধ্যে কিছু বিশেষ গুণাবলি থাকা আবশ্যক । এই বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর অন্তরকে আল্লাহর আনুগত্য ও রাসুলের সুন্নাহ অনুসরণের প্রতি উৎসাহিত করে। এই অধ্যায়ে আমরা দাওয়াহ ও তাবলীগের কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব, যা দাঈর চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গিতে অপরিহার্য।

১. একনিষ্ঠতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য

দাওয়াহ'র কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত—আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। ইখলাস বা অন্তরের বিশুদ্ধ নিয়ত ছাড়া এ কাজের কোনো প্রকৃত মূল্য নেই । খ্যাতি, সম্পদ বা সামাজিক অবস্থান অর্জনের বাসনা যদি দাওয়াহর পেছনে থাকে, তবে সেই আমল আল্লাহর দরবারে অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায় ।

একজন দাঈ তাঁর মন, চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা এবং আত্মাকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে। কুরআন ও হাদীসে নিয়তের গুরুত্বকে অত্যন্ত জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে । হাদীস অনুযায়ী, "সমস্ত কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল" ।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

"যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে এবং আল্লাহর ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।"

(সূরা কাহফ, আয়াত ১১০)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, ইবাদত ও সৎকাজ তখনই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন তা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়—শিরকমুক্তভাবে। দাওয়াহ যেহেতু অন্যতম উত্তম সৎকাজ, তাই এই কাজও ইখলাস ছাড়া পরিপূর্ণ হতে পারে না ।

যারা দুনিয়াবি স্বার্থে দাওয়াহ'র কাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে এই পার্থিব জীবনে কিছু ফল দিতে পারেন, তবে আখেরাতে তাদের আমল নিষ্ফল হয়।
আল্লাহ বলেন:

"যারা পার্থিব জীবনের জৌলুস চায়, আমি তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেই... কিন্তু আখেরাতে তাদের জন্য আছে জাহান্নাম।"
(সূরা হূদ, আয়াত ১৫–১৬)
দাওয়াহ ও তাবলীগের মূল চালিকাশক্তি হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একনিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা । দাঈর প্রতিটি কাজ, কথা ও কর্মে এই নিয়তের প্রকাশ থাকতে হবে। অন্তর যত বেশি খাঁটি হবে, আমল তত বেশি নিখুঁত হবে। একজন প্রকৃত দাঈ সেই, যার দাওয়াহ আল্লাহর ভালোবাসা, রাসূলের সুন্নাহ, ও জবাবদিহিতার অনুভূতিতে গঠিত। ইখলাসবিহীন দাওয়াহ—তাতে হয়তো বাহ্যিক সাড়া পাওয়া যায়, কিন্তু তা আখেরাতে কোনো কাজে আসে না।

২. নম্রতা ও সহনশীলতা

দাওয়াহ'র ক্ষেত্রে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করার পাশাপাশি তাঁদের সাথে আদব ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ অপরিহার্য। একজন দাঈর বক্তব্য হওয়া উচিত সহজ, সরল ও বোধগম্য। রূঢ় ব্যবহার, অপমানজনক শব্দ কিংবা ধৈর্যহীনতা দাওয়াহ'র কার্যকারিতা ব্যাহত করে। মানুষের মানসিকতা ও পরিবেশ অনুযায়ী তাঁদের সাথে সম্যক আচরণ করাই দাঈর প্রজ্ঞার পরিচয়।

আল-কুরআনের একটি আলোচিত নির্দেশনায় আল্লাহ মুসা ও হারুন আলাইহিমাস সালামকে ফিরআউনের নিকট পাঠিয়ে বলেন:

“তোমরা তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলো; হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় পাবে।”
(সূরা ত্বাহা, আয়াত ৪৪)

যদিও ফিরআউন ছিল জুলুমের প্রতীক, তবু নবীদের আদেশ ছিল নরম ভাষা ব্যবহারের—এটি দাওয়াতে বিনয় কতটা জরুরি তা প্রমাণ করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ দাওয়াতে নম্রতা ও সহনশীলতার সর্বোচ্চ নিদর্শন স্থাপন করেছেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনায় জানা যায়, তিনি কখনো ব্যক্তিগত ক্ষোভে প্রতিশোধ নেননি, বরং কেবল আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হলে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতেন।

তায়েফে যখন তাঁর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করা হয়, তখনও তিনি তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেননি; বরং আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, যেন তাঁদের বংশধরদের মধ্যে এমন কেউ আসে যারা তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করবে। এর চেয়ে বড় সহনশীলতার দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে?

এসব ঘটনা বোঝায়—দাঈর জন্য শুধু জ্ঞান নয়, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মানবিক অনুভূতিও অপরিহার্য।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

“তোমার রবের পথে আহ্বান করো প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সবচেয়ে উত্তম পন্থায়।”
(সূরা নাহল: ১২৫)

মানুষের বিরোধিতা ও কটুক্তি কখনো দাঈর মনোবল দুর্বল করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ নিজেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন—“তাদের কথায় ব্যথিত হয়ো না, কারণ সম্মান তো শুধু আল্লাহর হাতে।”

দাঈ যেন একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতো; যেমন চিকিৎসক রোগীর প্রকৃতি বুঝে ওষুধ দেন, তেমনি দাঈকে প্রতিটি মানুষের মনস্তত্ত্ব বুঝে উপদেশ দিতে হয়। ভুল মানুষের কাছে ভুল পদ্ধতি প্রয়োগ করলে ক্ষতি হতে পারে।

তবে নম্রতার অর্থ এই নয় যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরব থাকা যাবে। মুসা আলাইহিস সালাম যখন তাঁর কওমকে গোমাত্ত পূজায় লিপ্ত দেখেন, তখন তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং আল্লাহর দেওয়া ফলক ভেঙে ফেলেন। কিন্তু তাঁর ক্রোধ ছিল আল্লাহর জন্য, নিজের জন্য নয়। পরে তিনি অনুশোচনাও প্রকাশ করেন।

একজন দাঈর মধ্যে ভদ্রতা, নম্রতা, সহনশীলতা ও মানবিকতা থাকা আবশ্যক। রূঢ়তা মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়, পক্ষান্তরে কোমলতা ও সহানুভূতি মানুষকে আকৃষ্ট করে।
প্রতিকূল অবস্থাতেও ধৈর্য ধরে সঠিক পন্থায় দাওয়াহ চালিয়ে যাওয়াই একজন সফল দাঈর বৈশিষ্ট্য।

৩. ধৈর্য ও ধারাবাহিকতা

দাওয়াতের পথে ধৈর্য একটি অপরিহার্য গুণ। এই যাত্রা কখনোই কণ্টকমুক্ত নয়। দাঈকে প্রায়ই বিরোধিতা, অবজ্ঞা, এমনকি শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়। এসব পরিস্থিতিতে স্থির থাকা এবং দায়িত্ব পালনে অবিচল থাকা—এটাই প্রকৃত ধৈর্য।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্যের সর্বোচ্চ উদাহরণ। নবুওয়াতের শুরু থেকেই তিনি নিরলসভাবে আল্লাহর পথে আহ্বান করে গেছেন। তিনি গোপনে ও প্রকাশ্যে, ব্যক্তি ও সমাজ—সকল পর্যায়ে মানুষকে দাওয়াহ দিয়েছেন। কোনো প্রতিবন্ধকতা বা অপমান তাঁকে দাওয়াতি মিশন থেকে ফেরাতে পারেনি। বিশেষ করে হজের মৌসুমে যখন আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে লোকেরা কাবাঘর অভিমুখে আসত, তিনি সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াহ দিতেন।

তায়েফে গমন ছিল তাঁর ধৈর্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আশা ছিল যে সেখানকার মানুষ তাঁর কথা গ্রহণ করবে, কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল নির্মম। তাঁকে তিরস্কার ও পাথর নিক্ষেপ করে রক্তাক্ত করে দেওয়া হয়। এমনকি তাঁর সঙ্গী যায়েদ ইবন হারেসাও আঘাতপ্রাপ্ত হন। ফেরেশতা পাহাড় ধ্বংস করার প্রস্তাব নিয়ে এলে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা প্রত্যাখ্যান করেন। বরং তিনি দোয়া করেছিলেন—“হয়তো এদের বংশধরদের মধ্যে কেউ একদিন আল্লাহর ইবাদত করবে।” এটি ছিল ক্ষমা, দূরদৃষ্টি ও ধৈর্যের অসাধারণ নিদর্শন।

পূর্ববর্তী নবীগণও ছিলেন ধৈর্যের প্রতীক। নূহ আলাইহিস সালাম নয় শতাধিক বছর তাঁর কওমকে আহ্বান করেছেন, অথচ মাত্র অল্প কয়েকজন তাঁর দাওয়াহ গ্রহণ করেছিল। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম নিজ পরিবার ও সম্প্রদায়কে দাওয়াহ দিতে গিয়ে নানা নির্যাতনের শিকার হন, তবু পিছিয়ে যাননি।

দাওয়াতের কাজ ফলপ্রসূ হতে সময় লাগে। এটি তাৎক্ষণিক ফল দেওয়ার মতো নয়। একজন কৃষক যেমন ধৈর্যসহকারে বীজ বপন করে, জমি পরিচর্যা করে এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ফসল পায়, তেমনি দাঈকেও অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়।

পবিত্র কুরআনে লোকমান আলাইহিস সালামের উপদেশে বলা হয়েছে—সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার সময় যে কষ্ট আসে, তা

সহ্য করতে হবে। আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে বলেছেন, বিরোধীদের কথায় দুঃখিত না হতে এবং ষড়যন্ত্রে হতাশ না হতে। বরং আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

সূরা আল-আসরের শেষাংশে বলা হয়েছে—"তারা পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে সত্যের এবং ধৈর্যের।" এতে বোঝা যায়, সফল মুমিন সমাজ গঠনে ধৈর্য একটি অপরিহার্য উপাদান।
ধারাবাহিকতার অর্থ হলো—যে পরিস্থিতিতেই থাকুক না কেন, দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখা। যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালাম কারাগারে থেকেও দুই কয়েদিকে ইসলামের দাওয়াহ দিয়েছিলেন। এতে প্রতীয়মান হয়—পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক, দাওয়াহ কখনো থেমে থাকা উচিত নয়।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই দুটি বিষয়ের মাঝে একটি বেছে নিতেন, সহজটিই গ্রহণ করতেন, যদি না তা গুনাহ হয়। তবে আল্লাহর কোনো বিধান লঙ্ঘিত হলে তিনি কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখাতেন। এটি তাঁর সহজতা ও নম্রতার পাশাপাশি দাওয়াতের কাজে কঠোর অবস্থান ও ধারাবাহিকতার প্রমাণ।

ধৈর্য এবং ধারাবাহিকতা একজন দাঈকে মানসিকভাবে দৃঢ় করে তোলে এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে শেখায়। কখনো কখনো মানুষের অবহেলা ও প্রত্যাখ্যান বেদনাদায়ক হতে পারে, কিন্তু দাওয়াতের মিশনে অবিচল থাকাই নবীদের আদর্শ। কুরআনে বলা হয়েছে: "স্মরণ করিয়ে দাও, যদি তাতে উপকার হয়।" অর্থাৎ ফলাফল অনিশ্চিত হলেও, দায়িত্ব পালনে কোনো শৈথিল্য চলবে না।

মোটকথা, ধৈর্য ও ধারাবাহিকতা এমন দুটি গুণ যা দাঈকে নিরুৎসাহিত না হয়ে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে দৃঢ় রাখে।

অধ্যায় ৭: আধুনিক যুগে দাওয়াহ ও তাবলীগের চ্যালেঞ্জ

দাওয়াহ হলো মানবজাতিকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করা—এটি ইসলামের একটি মৌলিক দায়িত্ব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছে মানবতার মুক্তির দিশারূপে, যিনি তাওহীদের বার্তা প্রচারে আজীবন সাধনা করেছেন। তিনিই একমাত্র নন, বরং পূর্ববর্তী নবীগণকেও পাঠানো হয়েছিল মানুষকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতে আহ্বান জানাতে এবং সকল তাগুত থেকে দূরে রাখতে।

দাওয়াতের উদ্দেশ্য শুধু কোনো ধর্মীয় মতবাদে ডাকা নয়, বরং মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি গভীর বিশ্বাস স্থাপন শেখানো এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করা। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দাওয়াহ ও তাবলীগের ময়দানে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হচ্ছে। আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য, প্রযুক্তি ও মতাদর্শিক পরিবর্তনগুলো এসব চ্যালেঞ্জকে আরও জটিল করে তুলেছে। নিচে এই যুগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ এবং তা মোকাবেলার পথ আলোচনা করা হলো:

১. ধর্মনিরপেক্ষতা ও মিডিয়ার প্রভাব

ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারা আজকের সমাজে একটি গভীর শিকড় গেঁড়ে বসেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময় ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসে সীমিত রেখে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন থেকে দূরে রাখতে চায়। ফলে দাওয়াহ'র কাজ শুধু আধ্যাত্মিক আমন্ত্রণে সীমাবদ্ধ না থেকে একটি সমাজব্যাপী মেধাগত সংগ্রামে পরিণত হয়। ধর্মনিরপেক্ষতা অনেকের মনে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার প্রতি দ্বিধা তৈরি করে।

মিডিয়া, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া, তথ্যের অভাবনীয় বিস্তার ঘটিয়েছে। একদিকে এটি ইসলামের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার কার্যকর মাধ্যম হতে পারে, অন্যদিকে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ও বিকৃত চিত্র উপস্থাপন করে মানুষের মনে

বিভ্রান্তি ও ভীতি সৃষ্টি করছে। প্রায়ই ইসলামকে সহিংসতা বা পশ্চাৎপদতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়, যা তরুণ প্রজন্মের মাঝে অনীহা সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন ইসলামি গোষ্ঠীর পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা ও চরমপন্থার প্রচার আরও বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। দাওয়াহকারীদের জন্য এটি এক বিশাল চ্যালেঞ্জ—কিভাবে ভুল প্রচারণা মোকাবিলা করে ইসলামের সঠিক, প্রজ্ঞাময় এবং মানবিক দিকগুলো তুলে ধরা যায়। মৌখিক আহ্বানের পাশাপাশি এখন দরকার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দক্ষতা ও কৌশলী উপস্থাপন।

মিডিয়া যুগে তথ্যের সহজলভ্যতা যেমন আশীর্বাদ, তেমনি এটি গভীর উপলব্ধি ছাড়াই বিভ্রান্তিকর ধারণা তৈরির একটি মাধ্যম। তরুণরা অগভীর ও ভুল তথ্য দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে দাওয়াহকারীদের উচিত ধৈর্যসহকারে, প্রজ্ঞার সাথে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করা এবং মানুষকে গভীর চিন্তায় উৎসাহিত করা।

আরেকটি চ্যালেঞ্জ হলো মানুষের মনোযোগ ধরে রাখা। প্রতিনিয়ত প্রচুর তথ্যের মুখোমুখি হওয়ায় ধর্মীয় বার্তা সহজেই হারিয়ে যেতে পারে। তাই দাওয়াহকে আকর্ষণীয়, প্রাসঙ্গিক এবং হৃদয়গ্রাহীভাবে উপস্থাপন করা জরুরি।

সংক্ষেপে, আধুনিক যুগে ধর্মনিরপেক্ষতা ও মিডিয়ার প্রভাব দাওয়াতের জন্য জটিল বাস্তবতা তৈরি করেছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজন জ্ঞান, ধৈর্য, প্রজ্ঞা এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা। ইসলামের সৌন্দর্য, যুক্তিভিত্তিকতা ও কল্যাণের বার্তাকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারলে মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর প্রেম ও ইসলামের প্রতি বিশ্বাস জন্মাতে বাধ্য।

ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিবন্ধকতা

ইসলাম এমন একটি বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা, যা জাতি, বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতির সীমারেখা অতিক্রম করে। দাওয়াহ'র প্রধান লক্ষ্য হলো—সকল মানুষের কাছে আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেওয়া, যাতে তারা সঠিক পথ চিনে নিতে পারে। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য এই মহান দায়িত্ব পালনে জটিলতা সৃষ্টি করে।

একজন দাওয়াহকারীর জন্য ভাষা একটি মৌলিক মাধ্যম। যখন তিনি ভিন্ন ভাষাভাষী বা সংস্কৃতির মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানান, তখন ভাষাগত বাধা প্রাথমিক প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। একই ভাষার মধ্যেও অঞ্চলভেদে উচ্চারণ, শব্দচয়ন এবং ভাব প্রকাশের ধরনে পার্থক্য দেখা যায়, যা বার্তা পৌঁছানোর স্পষ্টতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা রাসূলদের তাদের স্বজাতির ভাষায় পাঠানোর উল্লেখ করেছেন, যাতে তারা সহজে ও পরিষ্কারভাবে সত্যের ব্যাখ্যা করতে পারেন। এটি প্রমাণ করে যে দাওয়াতে ভাষার স্পষ্টতা ও প্রাসঙ্গিকতা অপরিহার্য।

ভাষার পাশাপাশি সংস্কৃতি দাওয়াহ'র আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও সামাজিক প্রেক্ষাপট থাকে। এসব ভিন্নতা দাওয়াহ'র বার্তা গ্রহণে প্রভাব ফেলে। একজন দাওয়াহকারীর উচিত, শ্রোতার সংস্কৃতিকে সম্মান দেখিয়ে এমনভাবে ইসলামের বার্তা উপস্থাপন করা, যা শ্রোতার মনে প্রত্যাখ্যানের পরিবর্তে আগ্রহ সৃষ্টি করে—তবে কখনো ইসলামের মূলনীতির সঙ্গে আপোষ না করে।

কখনো কখনো সাংস্কৃতিক রীতি ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সরাসরি বিরোধিতা বা কঠোর ভাষা ব্যবহার না করে, শান্তভাবে যুক্তিসম্মত আলোচনা ও ইসলামের নৈতিক সৌন্দর্য তুলে ধরা অধিক কার্যকর। প্রজ্ঞা, সদুপদেশ এবং নম্রতা—এসব গুণের মাধ্যমেই হৃদয় জয় করা সম্ভব।

একটি সমাজে যে দাওয়াহ পদ্ধতি কার্যকর, অন্য সমাজে তা তেমন ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। কোথাও সরাসরি কথোপকথন কার্যকর, আবার কোথাও লিখিত পুস্তক, সামাজিক উদ্যোগ বা ডিজিটাল মাধ্যম অধিক উপযোগী হতে পারে। এই পদ্ধতিগত নমনীয়তা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

তরুণদের মাঝে অনীহা ও বিভ্রান্তি

আধুনিক যুগে দাওয়াহ'র একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হলো তরুণদের মধ্যে ধর্মবিমুখতা এবং মতাদর্শগত বিভ্রান্তি। তারা বিশ্বের সর্বাধিক উন্মুক্ত ও প্রভাবগ্রস্ত শ্রেণিগুলোর একটি, যাদের সামনে ইন্টারনেট, গণমাধ্যম ও বৈশ্বিক সংস্কৃতির দরজা সবসময় খোলা। এই সহজলভ্যতা অনেক সময় তাদের চেতনায় দ্বিধা তৈরি করে এবং ধর্মীয় অনুশীলনের প্রতি আগ্রহ কমিয়ে দেয়।

ধর্ম থেকে দূরে সরে যাওয়ার পেছনে বিভিন্ন কারণ কাজ করে। বস্তুবাদী সমাজে ভোগবিলাস আর সফলতাকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে তুলে ধরা হয়, যার ফলে তরুণরা পার্থিব মোহে জড়িয়ে পড়ে এবং আধ্যাত্মিক জীবনকে অবহেলা করে। অপরদিকে, মিডিয়া প্রায়শই এমন এক জীবনধারা প্রচার করে, যা ধর্মীয় মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচারিত জীবনধারার চটক তরুণদের প্রভাবিত করে এবং ধীরে ধীরে তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে।

বিভিন্ন মতাদর্শ—যেমন ধর্মনিরপেক্ষতা, নাস্তিকতা ও উদারনৈতিক চিন্তা—তরুণদের মনে সংশয় সৃষ্টি করে। একে সঙ্গে যুক্ত হয় ইসলামের নামে নানা বিভক্তি ও ভিন্ন ব্যাখ্যা, যা তাদের মনে বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। কখনো কঠোর এবং অনমনীয় দাওয়াতের ধরণও তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। তরুণদের বাস্তবতা ও মানসিক অবস্থা না বুঝে যদি শুধুমাত্র কঠিন ভাষা বা নিন্দার আশ্রয় নেওয়া হয়, তাহলে তা আরও দূরত্ব তৈরি করে।

ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবও একটি বড় কারণ। অনেকেই ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো না জেনে বা ভুলভাবে জেনে বিভ্রান্ত হয়। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় জ্ঞানকে প্রাধান্য না দেওয়াও এর অন্যতম কারণ। ফলে তারা যুক্তিহীন প্রশ্ন ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের শিকার হয়।

অধ্যায় ৮: সমাধান ও কার্যকর দাওয়াহ কৌশল

আজকের বিশ্বে দাওয়াহ কেবল বার্তা পৌঁছে দেওয়ার একটি সাধারণ প্রচেষ্টা নয়; বরং এটি একটি কৌশলগত, প্রজ্ঞাভিত্তিক ও যুগোপযোগী কার্যক্রম। দাওয়াহ সফল করতে হলে সমাজের পরিবর্তনশীল বাস্তবতা, প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং মানুষের মানসিক কাঠামো বিবেচনায় নিয়ে হালনাগাদ পদ্ধতির সংযুক্তি অত্যন্ত জরুরি। তবে এ আধুনিকায়ন যেন দাওয়াহর মৌলিক নীতি, আকীদা ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়—এই বিষয়ে সর্বোচ্চ সচেতনতা থাকতে হবে। দাওয়াহকে কার্যকর করতে হলে যেমন প্রযুক্তি ও যোগাযোগের আধুনিক উপায় প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সঠিক জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সহনশীলতা এবং নৈতিক দৃঢ়তা।

এই প্রজ্ঞাবান ও হিকমাতপূর্ণ দাওয়াহর প্রকৃত আদর্শ আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন। তিনি যে দাওয়াহ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, তা যুগে যুগে সর্বোত্তম মডেল হিসেবে বিবেচিত। তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুসরণ বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর ভিত্তিতে দাওয়াহ পরিচালনা করাই সঠিক পথ। ভাষা, বক্তব্য ও বিতর্কে হতে হবে সৌন্দর্যপূর্ণ, পরিশীলিত ও আদর্শিক। দাওয়াহ এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যেন তা শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করে এবং তাকে আলোর পথে ডেকে আনে।

এই পথচলায় একজন দাঈর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও ঈমানদারিত্ব দাওয়াহর সফলতার মূল স্তম্ভ। ঈমান এমন একটি অন্তর্নিহিত শক্তি যা দাঈকে আল্লাহ, রাসূল এবং আখিরাতের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ভালোবাসা অর্জনে সাহায্য করে। তার চিন্তা, আবেগ, কর্ম ও আত্মা— কিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। এই গভীর ঈমানের শক্তিতেই সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) একটি ক্ষুদ্র দল হয়েও বৃহৎ সমাজে বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজকের দাঈকেও সেই ঈমান, নৈতিকতা ও আত্মসচেতনতার মাধ্যমে দাওয়াহর ময়দানে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে।

আধুনিক প্রেক্ষাপটে দাওয়াহের কৌশল

বর্তমানে প্রযুক্তি দাওয়াহের এক বিশাল সুযোগ সৃষ্টি করেছে। অতীতে যেমন কবিতা, সাহিত্য বা নাটক ব্যবহৃত হতো, এখন তা করা যায় ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া, ভিডিও, পডকাস্ট ও অ্যাপের মাধ্যমে। এই মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায় বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে।

তবে প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্কতা জরুরি। দাওয়াহ'র বার্তা হতে হবে সত্যনিষ্ঠ, সহজবোধ্য ও অতিরঞ্জনবিহীন। ভুল বা ভ্রান্ত তথ্য প্রচার করা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। কুরআন আমাদের সতর্ক করেছে, যারা জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তদনুযায়ী আমল করে না, তারা বোঝাপড়াহীন কিতাব বহনকারীর মতো।

প্রযুক্তি ব্যবহারে শ্রোতার মানসিকতা, বয়স ও গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনায় রাখা জরুরি। তরুণ ও বৃদ্ধ শ্রোতার চাহিদা এক নয়। এজন্য উপস্থাপনার ভাষা, মাধ্যম ও কনটেন্ট ভিন্ন হতে পারে। দাঈর দায়িত্ব হলো এসব বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনা করা।

এছাড়া, দাঈর ব্যক্তিত্ব, আচরণ ও অন্তরের একনিষ্ঠতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুখে এক কথা, আর কাজে অন্য কিছু হলে মানুষ তার প্রতি বিশ্বাস হারায়। প্রযুক্তি যেন আত্মপ্রচারের হাতিয়ার না হয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদতের মাধ্যম হয়। যারা কেবল দুনিয়ার লাভ কামনা করে, তাদের দাওয়াহ নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক হয় না।

প্রযুক্তিনির্ভর কিছু দাওয়াহ উদ্যোগ

- তরুণদের জন্য ইসলামিক বিষয়ভিত্তিক অ্যানিমেটেড ভিডিও তৈরি।
- যাতায়াতকালীন সময় কাজে লাগাতে ইসলামিক পডকাস্ট।
- সোশ্যাল মিডিয়ায় সংক্ষিপ্ত পরামর্শ ও নৈতিক বার্তা ইনফোগ্রাফিক্সে উপস্থাপন।

- ইসলামিক বই, প্রবন্ধ, ফতোয়া ইত্যাদি সহজে পেতে ওয়েবসাইট তৈরি।
- মোবাইল অ্যাপে নামাযের সময়সূচি, কুরআনের অনুবাদ, হাদীস সংগ্রহের সুবিধা।

তবে, প্রযুক্তি ব্যবহারে ফিতনার আশঙ্কা উপেক্ষা করা যাবে না। বিভ্রান্তিকর তথ্য, গুজব ও বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য থেকে নিজেকে এবং অন্যদের রক্ষা করতে সঠিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রয়োগ অপরিহার্য। বিতর্কের ক্ষেত্রেও শালীনতা বজায় রাখা জরুরি। ব্যক্তিগত আক্রমণ দাওয়াহর মূলনীতির পরিপন্থী।

প্রযুক্তি-নির্ভর দাওয়াহ প্রক্রিয়াকে ধাপে ধাপে সাজানো যেতে পারে। নতুনদের জন্য ইসলামের মৌলিক আকীদা ও ইবাদত বিষয়ক শিক্ষা দিয়ে শুরু করা এবং পরে পর্যায়ক্রমিক জ্ঞানদান। অনলাইনে কোর্স, ভিডিও টিউটোরিয়াল এবং নতুন মুসলিমদের জন্য আলাদা কমিউনিটি গড়ে তোলা যেতে পারে, যেখানে তারা শেখার পাশাপাশি ভাইচারিত্রিক সম্পর্ক গড়তে সক্ষম হবে।

আধুনিক প্রযুক্তি দাওয়াহকে শুধু স্থানীয় পর্যায়ে নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ দিয়েছে। আগে রাসূলুল্লাহ (সা.) দূত পাঠাতেন, এখন বিভিন্ন ভাষায় অনলাইন কনটেন্ট তৈরি করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামের বার্তা পৌঁছানো সম্ভব।

সঠিক জ্ঞান, আন্তরিকতা এবং বাস্তব জীবনে আমলের মাধ্যমে প্রযুক্তিনির্ভর দাওয়াহ হতে পারে আজকের যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকর মাধ্যম।

ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক উপযোগিতা

কার্যকর দাওয়াহ'র জন্য শ্রোতার ভাষা এবং সংস্কৃতি বোঝা এবং সেই অনুযায়ী বার্তা উপস্থাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দাওয়াহ'র বার্তা এমনভাবে উপস্থাপন করা উচিত যেন তা সহজ, স্পষ্ট এবং শ্রোতার বোধগম্য হয়। বিশেষত যখন ভিন্ন

সংস্কৃতির মানুষের কাছে দাওয়াহ দেওয়া হয়, তখন তাদের রীতিনীতি, বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই জ্ঞান দাঈকে শ্রোতার সাথে কার্যকরী সংযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করবে এবং তাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করতে সক্ষম করবে।

ভাষাগত উপযোগিতা কেবল অনুবাদ নয়, বরং বার্তার মর্ম এবং উদ্দেশ্য শ্রোতার ভাষার রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী উপস্থাপন করা। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন জাতির কাছে তাদের নিজস্ব ভাষায় রাসূল প্রেরণ করার নির্দেশনা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং সংস্কৃতির লোকদের কাছে দাওয়াহ দিয়েছেন, যা তার দাওয়াহ পদ্ধতির সর্বোত্তম উদাহরণ।

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে দাওয়াহ দেওয়ার জন্য কিছু কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন:

- হিন্দু বা খ্রিস্টান ভাইদের কাছে দাওয়াহ দেওয়ার সময় তাদের বিশ্বাস ও ধর্মীয় গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে, তাদের সাথে সংলাপ করা যেতে পারে। মানবিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে আলোচনার সূচনা করা উপকারী হতে পারে।
- বিভিন্ন পেশা বা জীবনধারার মানুষের কাছে দাওয়াহ দেওয়ার সময় তাদের জীবনযাত্রার সাথে সম্পর্কিত উদাহরণ ব্যবহার করা যেতে পারে।
- শহুরে ও গ্রামীণ সংস্কৃতির পার্থক্য বিবেচনা করে দাওয়াহ’র পদ্ধতি পরিবর্তন করা উচিত।
- জাতিগত বা আঞ্চলিক সংস্কৃতির ভিন্নতা অনুযায়ী দাওয়াহ’র উপকরণ (যেমন: পোশাক, সঙ্গীত, শিল্পকলা) নির্বাচন করা যেতে পারে।

এটি মনে রাখতে হবে যে, সাংস্কৃতিক উপযোগিতা কখনোই ইসলামের মৌলিক নীতির প্রতি আপোষ করা নয়। দাওয়াহ'র মূল বার্তা সর্বদা আল্লাহর একত্ববাদ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের উপর ভিত্তি করে থাকবে। তবে এই বার্তা শ্রোতার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী উপস্থাপন করার কৌশল ভিন্ন হতে পারে।

দাঈকে অবশ্যই স্থানীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতে হবে, যাতে ভুল বোঝাবুঝি বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানো যায়। কিছু সংস্কৃতিতে সরাসরি কথা বলা উপযুক্ত নাও হতে পারে, সেক্ষেত্রে ইঙ্গিতে বা পরোক্ষভাবে বার্তা দেওয়া যেতে পারে, তবে সত্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন।

একজন দাঈয়ের নিজস্ব চরিত্র ও আচরণ তার সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা কতটা, তা শ্রোতার মনে প্রভাব ফেলে। যদি তিনি স্থানীয় রীতিনীতি (যা শরীয়ত বিরোধী নয়) অনুসরণ করেন এবং মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন, তবে তার দাওয়াহ সহজেই গ্রহণযোগ্য হবে।

সংক্ষেপে, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক উপযোগিতা কার্যকর দাওয়াহ'র জন্য অপরিহার্য। এটি দাঈকে শ্রোতার হৃদয়ে প্রবেশ করতে এবং ইসলামের বার্তাকে প্রাসঙ্গিক ও গ্রহণীয় করে তুলতে সাহায্য করে।

তরুণ প্রজন্মকে দাওয়াহে সম্পৃক্তকরণ

তরুণ প্রজন্ম সমাজের ভবিষ্যৎ এবং দাওয়াহ'র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য গোষ্ঠী। তারা শুধু দাওয়াহ'র কাজের অংশীদার হতে পারে না, বরং এতে অংশগ্রহণ তাদের নিজস্ব ঈমান এবং চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। তরুণদের আধুনিক পৃথিবীর চ্যালেঞ্জ ও ডিজিটাল সংস্কৃতির সাথে মেনে চলতে হয়, তাই তাদের কাছে দাওয়াহকে প্রাসঙ্গিক এবং আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

তরুণদের দাওয়াহ'র কাজে সম্পৃক্ত করার জন্য কয়েকটি কার্যকর কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে:

- তাদের মতামত ও পরামর্শকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং দাওয়াহ'র পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা উচিত।
- নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশে সাহায্য করা উচিত, যাতে তারা দাওয়াহ'র বিভিন্ন প্রকল্পের দায়িত্ব নিতে পারে।
- তাদের প্রয়োজন এবং আগ্রহের ভিত্তিতে দাওয়াহ'র বিষয় নির্বাচন করা উচিত, যেমন আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সামাজিক ন্যায়বিচার, পরিবেশ সচেতনতা, মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা।
- প্রযুক্তির সাহায্যে তরুণদের কাছে পৌঁছানো যেতে পারে, যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, গেমিং প্ল্যাটফর্ম এবং অনলাইন ফোরামের মাধ্যমে দাওয়াহ'র বার্তা পৌঁছানো।
- তাদেরকে প্রশ্ন করার এবং নিজেদের মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া উচিত। তাদের সন্দেহ বা প্রশ্নের উত্তর প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সাথে প্রদান করা উচিত, কঠোর না হয়ে ধৈর্য সহকারে আলোচনা করা।
- ইসলামিক জ্ঞান অর্জনকে সহজ এবং আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য interactive শেখার পদ্ধতি, গেমিফিকেশন বা আধুনিক শিক্ষার কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে।

- তরুণদের রোল মডেল বা আদর্শ দাঈদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত, যারা তাদের বয়সের কাছাকাছি এবং যাদের জীবনধারা তাদের কাছে অনুপ্রেরণাদায়ক।
- তরুণদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে দাওয়াহ'র কাজ করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে, যেমন মসজিদ বা কমিউনিটি সেন্টারে সাপ্তাহিক আলোচনাচক্র, পাঠচক্র বা সামাজিক সেবামূলক প্রকল্প আয়োজন করা।
- তাদের মধ্যে ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত এবং বিভাজন সৃষ্টিকারী দল বা বিতর্ক থেকে তাদের দূরে রাখার পরামর্শ দেওয়া উচিত। তাদেরকে বোঝানো উচিত যে মুসলিম উম্মাহ এক এবং কুরআন ও সুন্নাহ তাদের ঐক্যের ভিত্তি।
- তাদের উৎসাহিত করা উচিত যেন তারা যা শিখে তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বান, "আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।"

তরুণদের দাওয়াহ'র কাজে সম্পৃক্ত করার সময় তাদের ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জগুলোও বিবেচনা করা উচিত, যেমন পারিবারিক চাপ, শিক্ষার ব্যস্ততা, আর্থিক সমস্যা ইত্যাদি, যা তাদের অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। দাঈদের উচিত এই সমস্যা বুঝে তরুণদের পাশে থাকা এবং তাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপনের গুরুত্ব শেখানো, যেখানে ইবাদত, জ্ঞান, পরিবার এবং সুস্থ বিনোদন সবকিছুরই স্থান থাকবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে অনেক তরুণ দাওয়াহ'র কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, যেমন মুস'আব ইবন উমায়ের, আলী ইবন আবী তালিব, উসামা ইবন জায়দ প্রমুখ। মুস'আব ইবন উমায়েরকে মদীনায় দাওয়াহ'র জন্য পাঠানো হয়েছিল এবং তার মাধ্যমে বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এটি প্রমাণ করে যে তরুণদের মধ্যে দাওয়াহ'র কাজের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

সুতরাং, তরুণ প্রজন্মকে অবহেলা না করে তাদের দাওয়াহ’র কাজে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদের শক্তি, উৎসাহ এবং আধুনিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে দাওয়াহকে আরও শক্তিশালী এবং কার্যকর করা সম্ভব।

গবেষণার সারসংক্ষেপ

আল্লাহর দিকে আহ্বান বা দা‘ওয়াহ ইসলামের একটি মৌলিক ফরয দায়িত্ব, যা প্রতিটি মুসলমানের উপর অর্পিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল মানুষকে সত্য দ্বীনের দিকে দাওয়াহ দেওয়া। একজন প্রকৃত দাঈ (যিনি আল্লাহর পথে আহ্বান করেন) -এর মাঝে এমন কিছু গুণ থাকা জরুরি, যা মানুষের অন্তরে ইসলামের সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা জাগ্রত করতে পারে এবং তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

দাঈ-এর ঈমান দৃঢ় হলে সে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনে সক্ষম হয় এবং নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়। দা'ওয়াতের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একটি ধারাবাহিক ও ধাপে ধাপে শিক্ষা প্রদান গুরুত্বপূর্ণ, যেমন: প্রথমে তাওহীদের সাক্ষ্য, এরপর সালাত প্রতিষ্ঠা, এবং তারপর যাকাত ও দান প্রদান।

দাওয়াহ’র কার্যক্রমে হিকমাহ (জ্ঞানপূর্ণতা), নম্রতা এবং মানুষের মনোভাব ও পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি। দাওয়াহ’র মাধ্যম হিসেবে বক্তৃতা, রচনা, গ্রন্থ, প্রবন্ধ কিংবা আধুনিক গণমাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি কেবল নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ঘর, বাজার, মসজিদসহ সব স্থানে এই দায়িত্ব পালন করা যায়।

একজন দাঈ-এর জন্য ইলম বা জ্ঞান অর্জন এবং সে অনুযায়ী আমল করাও অপরিহার্য। শুধু জ্ঞান নয়, বরং সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল না করলে তা ত্রুটিপূর্ণ ও নিন্দনীয় হয়। দাওয়াহ’র মানদণ্ড হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহকে গ্রহণ করতে

হবে এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুসরণের পরিবর্তে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যাচাই-বাছাই করতে হবে।

এই পথে অনেক বাধা আসতে পারে—বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া, নতুন মুসলিমদের প্রতি অতিরিক্ত চাপে ফেলা, নেতৃত্ব ও খ্যাতির মোহে বিভ্রান্তি, অথবা সাধারণ মানুষের উদাসীনতা। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ধৈর্য ও ইস্তিকামাহ অত্যন্ত জরুরি। একইসাথে, দাওয়াতের কাজে উম্মাহর ঐক্য বজায় রাখা অত্যাবশ্যক।

উপসংহার ও পরামর্শ

তথ্য ও উৎস বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয় যে, দাওয়াহ শুধু একটি ইবাদত নয় বরং এটি ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যা প্রতিটি মুসলমানের উপর বর্তায়। সফল দাওয়াহ'র জন্য দাঈ-এর উচিত:

- দৃঢ় ঈমান, সৎ আমল এবং ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী হওয়া
- কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে অটল থাকা এবং প্রজ্ঞা ও কৌশলের মাধ্যমে দাওয়াহ প্রদান
- নিরবচ্ছিন্ন আত্মোন্নয়ন এবং চরিত্র গঠনে সচেষ্ট থাকা
- সময়, স্থান ও ব্যক্তির প্রেক্ষাপটে দাওয়াতের কৌশল পরিবর্তন করা, তবে মূলনীতিতে অটল থাকা
- কথার সাথে কাজের সামঞ্জস্য রেখে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা
- সব বাধা ও চ্যালেঞ্জে ধৈর্যধারণ ও দৃঢ় মনোবল বজায় রাখা
- উম্মাহর মধ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা
- দাওয়াতের কাজে সর্বদা আল্লাহর সাহায্য কামনা ও তাঁর উপর ভরসা রাখা

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা

- দাওয়াহ'র কাজকে আরও ফলপ্রসূ করতে নিচের সুপারিশসমূহ বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে:
- দাঈদের প্রশিক্ষণের জন্য নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গঠন এবং পুরনো প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নত করা
- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইসলামিক নীতির আলোকে দাওয়াতের নতুন মাধ্যম ও কৌশল উদ্ভাবন ও গবেষণা করা
- দাওয়াতী সংগঠনগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- বিভিন্ন বয়স, পেশা ও ধর্মের মানুষের জন্য উপযোগী দাওয়াহ পদ্ধতি তৈরি করা

- বহুভাষিক ও বিভিন্ন মাধ্যমে উপস্থাপনযোগ্য দাওয়াতী উপকরণ তৈরি ও বিতরণ বৃদ্ধি করা
- দাওয়াহকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক না রেখে পুরো উম্মাহর সম্মিলিত দায়িত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা
- দাওয়াহকর্মীদের জন্য মানসিক, নৈতিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা

তথ্যসূত্র:

- *দাওয়াত সম্পর্কিত ৪০ টি হাদীস* — মুফতি যুবায়ের আহমেদ
- *আল্লাহর পথে দাওয়াত* — ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
- *দাওয়াতের ফিকির ও আমলের ময়দান* — মুফতি যুবায়ের আহমেদ
- *দাওয়াতের ফিকির ও আমলের ময়দান* — হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দীকি সাহেব
- *অমুসলিমদের সাথে রাসূল (সা.)-এর আচরণ প্রসঙ্গ* — ড. রাগীব আস-সারজানী
- *আল্লাহর দিকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের কিছু বাস্তব নমূনা* — সাঈদ ইবন আলী ইবন ওহাফ আল-কাহতানী
- *দ্বীনে হকের প্রতি দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি* — মাওলানা দেলওয়ার হোসেন সাইদী
- *দ্বীনের দাওয়াত* — আব্দুল হামীদ মাদানী